তুলি-কলম

চৈতন্য-পরিকর নরহরি সরকার ও তাঁর পদাবলি

পুরঞ্জয় তন্তুবায়

বঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ও প্রসার মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বহুগুণিত হয়েছিল, একথা সর্বজনবিদিত। বাংলার সাহিত্য ও ইতিহাস, বিশেষত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেতিহাসের পর্যালোচনায় সমকালীন পদকর্তাদের রচিত পদগুলি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু শ্রীচৈতন্যকেন্দ্রিকই নয়, তাঁরা নিজেদের ভক্তহৃদয়ের আকুতির ছাপ রেখে গেছেন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলিতেও। চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরহরি সরকার ছিলেন সেইরকমই একজন পদকর্তা।

বাংলায় বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে একাধিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্বাস, মতাদর্শ ও আচরণের পার্থক্যে সেসব সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র। নরহরি সরকার শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। বৈষ্ণবসমাজে বরাবরই শ্রীখণ্ডের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষেত্রটি বৈদ্যখণ্ড নামে পরিচিত ছিল। বিশিষ্ট বৈষ্ণব নারায়ণ দাসের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন নরহরি। চৈতন্যপূর্ববর্তী শ্রীখণ্ডের এই বৈদ্যবংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। পরে নরহরির পাশাপাশি আরও দুজন শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়কে গৌরবান্বিত করেছিলেন—তাঁর দাদা মুকুন্দ আর তাঁর পুত্র রঘুনন্দন। ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস লিখেছেন, ''খণ্ডবাসী ভক্তদের কবিপ্রাণতা পাণ্ডিত্য ত্যাগ করে নিরিবিলি অনুভবের ক্ষেত্রটি বেছে নেয় নরহরির সময় থেকে।''[১] পরবর্তী কালে গৌরাঙ্গই পরম ও গৌরাঙ্গই প্রথম—এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে নরহরি সরকার গৌরপারম্যবাদের আশ্রয় নেন এবং গৌরনাগরবাদের প্রবর্তন করেন। সঙ্গে মুকুন্দ ও রঘুনন্দন তো ছিলেনই। নরহরির অনুরাগী বন্ধু ও শিষ্য-প্রশিষ্যগণও গৌরনাগরবাদের তাত্ত্বিক দিকটি গ্রহণ করে শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের উপাসনাকে অব্যাহত রেখেছিলেন।

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে নরহরির অবস্থানকে নিয়ে গবেষকদের নানা মত। লোচনদাসের কাব্যে উল্লেখ আছে নরহরি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার সময় গদাধর ও নরহরি মহাপ্রভুর কাছে ছিলেন—

''নরহরি গদাধর নাচে কাছে কাছে।
সকল বৈষ্ণব নাচে গৌরহরি মাঝে॥''

'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস নরহরি সরকার সম্পর্কে একেবারেই নীরব, কিন্তু কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে তাঁর যৎসামান্য উল্লেখ আছে। নরহরিকে এই উপেক্ষার কারণ হিসেবে গৌরনাগরবাদের প্রতিষ্ঠাকেই অনেকে তুলে

ধরেছেন। গৌরনাগরবাদে গৌরাঙ্গকে নাগররূপে কল্পনা করা হয়। এই মতাবলম্বীদের কাছে সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের চেয়ে চাঁচর-চিকুরধারী চৈতন্যদেব অধিক আকর্ষণের পাত্র। পরবর্তী কালে রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'-তে নরহরির শাখা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায়—

''নরহরিকে কহে সবে নরহরি-চৈতন্য।
না জানিয়া মূঢ় লোকে কহে তারে অন্য॥''[২]

এখানে দুটি দিক স্পষ্টই উঠে আসে। এক, নরহরির অনুরাগীরা তাঁকে চৈতন্যদেবের পাশে স্থান দিয়েছিলেন, 'নরহরি-চৈতন্য' কথাটি সেই সাক্ষ্যই বহন করে। দুই, অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কিছু ভক্ত নরহরির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। গৌরাঙ্গের 'নদীয়া-নাগর' ভাবটিকে তাঁরা স্বীকার করতেন না। একথা ঠিক, বৈষ্ণবধর্মের মূল ধারায় শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের মতাদর্শ ও আচরণ খুব বেশি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

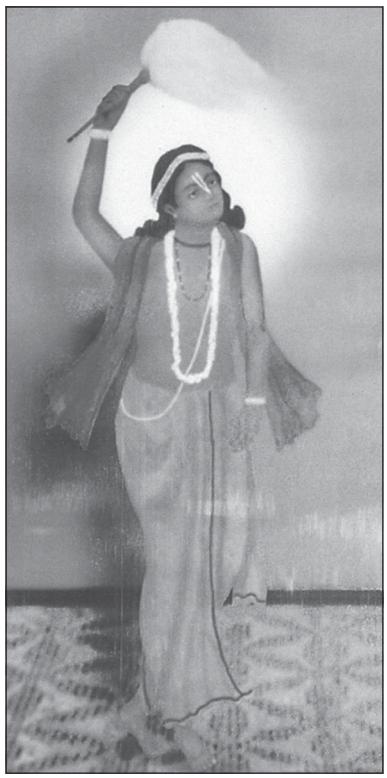
নরহরি সরকার : অঙ্কিত চিত্র

রাধাকুণ্ডে সমাধি

নরহরি মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও প্রিয়পাত্র ছিলেন নিঃসন্দেহে। সম্প্রদায়গত বিরোধে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও নিজস্ব মতাদর্শ তিনি ত্যাগ করেননি বলেই মনে হয়। সাধক নরহরি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে অনুভব করেছিলেন সম্পূর্ণ লৌকিকভাবে, অতিলৌকিকতায় নয়। গবেষক বলেছেন, ''তিনিই প্রথম শ্রীচৈতন্যের জীবনের ইতিহাসসম্মত সন্ধানের চেষ্টা ও বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।''[৩] দ্বিমত নেই, নরহরি সেটা করতে পেরেছিলেন। গৌরাঙ্গের সঙ্গে গদাধরের সম্পর্কটি অনুধাবন করে নরহরিই প্রথম গৌর-গদাই মূর্তির উপাসনা শুরু করেন। কারণ তিনি গদাধরকে বিষ্ণুশক্তির আধার ও শ্রীরাধার অবতার বলে মনে করতেন। গৌর-গদাধরলীলাকে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার অনুরূপ মনে করতেন। তাই গৌরাঙ্গের পাশে গদাধরকেই তিনি বেশি মানতেন, যদিও অন্যদের প্রতিও তাঁর ভক্তি কিছু কম ছিল না। ফলত ''নিত্যানন্দ নীলাচল হইতে আসিবার পরে গৌর-নিতাই পূজার প্রচলন হইলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল।''[৪] তাহলে শুধু গৌরনাগরবাদের প্রচলনের জন্যই নয়, গৌর-গদাই মূর্তির উপাসনা প্রবর্তনের কারণেও নরহরির প্রতি বৈষ্ণবরা কিছুটা বিরূপ হয়েছিলেন বোঝা যায়।

মোটামুটি এই হল নরহরি সরকারের অবস্থানগত দিক। পদাবলি ছাড়াও তিনি দুখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন—'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত' ও 'গৌরাঙ্গাষ্টকালিকা'। পদাবলিতে যেহেতু একাধিক নরহরির অস্তিত্ব, তাই 'নরহরি' ভণিতায় অনেক পদ মিশে গিয়ে প্রাথমিকভাবে ভ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর রচিত পদ

নির্বাচনের ক্ষেত্রে। পদাবলির শৈলী ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে শেষপর্যন্ত বিভিন্ন সংকলনে নরহরি সরকারের নামে কিছু পদ সংকলিত হয়েছে। পদকল্পতরুতে পঁয়ত্রিশটি (নরহরি ভণিতায়), গৌরপদতরঙ্গিণীতে শতাধিক পদ নরহরি সরকারের নামে সংকলিত (তবে সব পদগুলিই যে আলোচ্য নরহরি সরকারের তা মনে করার কারণ নেই)। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বৈষ্ণবপদাবলী' সংকলনে নরহরি সরকারের ঊনত্রিশটি পদের উল্লেখ করেছেন। সবগুলিই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক—দুধরনেরই পদ তিনি রচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত, রায়শেখরের একটি পদ নরহরির পদরচনার সময়কাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে গভীর মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে। সেখানে উদ্ধৃত, 'গৌরাঙ্গজন্মের আগে' তিনি ব্রজলীলার গান রচনা করতেন। কিন্তু গৌরাঙ্গজন্মের আগে তাঁর পদরচনার কথা অসম্ভব ও অসংগত। যদি সেটা 'চৈতন্যজন্মের আগে' ধরা হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াতে পারে যে, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নেওয়ার আগে তিনি পদরচনা করতেন। অথবা হতে পারে রায়শেখর 'চৈতন্যজন্মের আগে'ই লিখেছিলেন। পরবর্তী কালে অনুলিপিকার অনবধানতাবশত সেটিকে 'গৌরাঙ্গজন্মের আগে' করে দিয়েছেন। 'গৌরাঙ্গ' ও 'চৈতন্য' নামের সূক্ষ্ম তফাতটি তাঁরা হয়তো বুঝতে পারেননি। তবে এ-বিষয়ে স্বচ্ছ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।

যাইহোক, নরহরি সরকারের পদাবলির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, ''নরহরি সরকারের কোন পদটি আসল আর কোনটি নকল তাহা চিনিতে হইলে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি ব্রজবুলি ব্যবহার করেন নাই। অত্যন্ত সরল সুন্দর বাংলা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পদে নরহরি চক্রবর্তীর ন্যায় উপমা-অনুপ্রাসের বাহুল্য নাই। তাঁহার পদে ছন্দঃপতন নাই। তাঁহার পদগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ রসঘন।''[৫] যেমন একটি বিখ্যাত পদ—''গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে।'' পদটিতে মহাপ্রভুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ছাপ স্পষ্ট। গৌর-গদাধরলীলা নরহরিকে প্রভাবিত করেছিল, তা এই পদটি পড়ে বোঝা যায়—

''গৌর-গদাধরলীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে নির্ণয়॥''

গৌরাঙ্গই পরম, গৌরাঙ্গই প্রথম—এই অনুভব গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলিতে তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ—

''গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা- বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥
গাও পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ ভবসাগরে এমন দয়াল
না দেখি যে একজন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেনু গলিয়া
কেমনু ধরিনু দে।
নরহরি হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে॥''

এ-পদটি অবশ্য অন্যান্য পদকর্তার নামেও পাওয়া যায়। পদটির কাব্যমাধুর্য অসাধারণ। তার সঙ্গে গৌরাঙ্গ-কর্তৃক 'রাধার মহিমা' প্রকাশের উদ্দেশ্যটিও ব্যক্ত হয়েছে। এতে সহজ ভাষায় গৌরানুরাগের আন্তরিক আবেদন যেন তিলে তিলে পূর্ণতা পেয়েছে। পদকর্তার ব্যক্তিহৃদয়ের আকুতি

ও আক্ষেপ বৈষ্ণবীয় বিনয়ে পর্যবসিত। আঙ্গিকগত দিক দিয়ে ত্রিপদী ছন্দে এ-পদ মাধুর্যমণ্ডিত। গৌরাঙ্গের পতিতপাবন রূপটি যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তারও স্বীকারোক্তি আছে এই পদে—

''গৌরাঙ্গ কেবা জানে মহিমা তোমার।
কলিযুগ উদ্ধারিতে পতিতপাবন অবতার॥
শ্যাম মহোদধি কেমনে বিধাতা
মথিয়া সে কতকাল।
কত সুধারসে তাতে নিরমিলা
উপজে গৌর রসাল॥
ত্রিভুবনে প্রেম বাদর হইল
গৌরপ্রেম বরিষণে।
দীনহীন জন ও রসে মগন
নরহরি গুণগানে॥''

নরহরি সরকার গৌরাঙ্গকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাণের মানুষটিকে কত গভীরভাবে অন্তরের মাধুরী মিশিয়ে অবলোকন করেছেন! গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনায় তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। গৌররূপ প্রত্যক্ষ দর্শনের সহজ প্রকাশ তাঁর পদে—

''কি হেরিলাম গোরারূপ না যায় পাসরা।
নয়ন অঞ্জন হৈয়া লাগি রৈল গোরা॥''

গৌরনাগরবাদে এই রূপমুগ্ধতা যেন পূর্বরাগকে সূচিত করে। নরহরির পদে এই সাক্ষাৎ দর্শনজাত পূর্বরাগের শৈল্পিক প্রকাশ। আবার গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস যেন কৃষ্ণবিচ্ছেদের মতো তাঁকে বিরহে দগ্ধ করে। কোমল ভক্তহৃদয়ের আকুতির যেন সীমা থাকে না, দুঃখের অন্ত থাকে না।

নরহরি চৈতন্য-সমকালীন একজন প্রধান বৈষ্ণব ভক্ত ও কবি। তাঁর খুব বেশি পদ পাওয়া যায়নি, কিন্তু যা আছে তার সংখ্যা অল্প হলেও বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও সাহিত্যে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকেন্দ্রিক নানা দিক এই পদগুলিতে উঠে এসেছে। সমালোচক বলেছেন, ''নরহরি সরকারের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নবদ্বীপ-লীলাতেও প্রভুর রাধার ভাবে ভাবিত হইয়া পূর্বরাগ, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, বিরহ প্রভৃতির বর্ণনা দিয়াছেন।''[৬] নরহরি শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার সামগ্রিক ভাববিন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। সমসাময়িক ভক্ত ও কবি হিসেবে গৌরাঙ্গকে নাগরভাবে উপাসনা করে বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে তিনি একটি অন্য মাত্রা যোগ করেন। নরহরির গৌরপারম্যবাদ ও গৌরনাগরবাদের আশ্রয়ে মানুষ-গৌরাঙ্গই যেন সব থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন, যা সেইসময় উপাসনার দিক দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে খুব সহজ ছিল না। কারণ এই উপাসনা গোপালমন্ত্র ছেড়ে গৌরমন্ত্রে দীক্ষার প্রথা চালু করেছিল। নরহরি স্বয়ং গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। অতএব বোঝা যায় শ্রীগৌরাঙ্গজীবনই নরহরি সরকারের কাছে 'পরম' হিসেবে আরাধিত হয়েছিল। তাঁর জীবনাচরণ ও পদাবলি সেই প্রমাণই বহন করে। ✠

তথ্যসূত্র

১। অচিন্ত্য বিশ্বাস, *লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র* (নিউ বইপত্র : কলকাতা, ২০১৯), পৃঃ ৪৫

২। সম্পাদক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল, *রামগোপাল দাস বিরচিত রসকল্পবল্লী ও অন্যান্য নিবন্ধ* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৩), পৃঃ ২১০

৩। *লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র*, পৃঃ ৪৬

৪। সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, খণ্ড ১, (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা), পৃঃ ২৮৬

৫। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯) পৃঃ ৫৩

৬। তদেব, পৃঃ ৫৬